মন্থন সাময়িকীর পাঠকসভা

রবিবার ৯ জুন, বেলা তিনটে

স্থান ৩১০ পর্ণশ্রী পল্লি। যোগাযোগ ৯৮৮৩৩৪৯১৫০, ০৩৩-২৪৯২৫৪৪৭ (গৌতম গাঙ্গুলি)
বেহালা থানা থেকে রবীন্দ্রনগরের অটোতে পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দিরের পরের স্টপেজ মাধুরী ফার্মেসি।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 23 1 June 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ১ জুন ২০১৩ শনিবার ২ টাকা

• চলতে চলতে পৃ ২ • পরমাণু চুক্তি পৃ ২ • পাঠশালা পৃ ২ • চারুচেতনা পৃ ৩ • মানি মার্কেট পৃ ৩ • মারুতি পৃ ৩ • মেক্সিকো পৃ ৪ • জল সাধা পৃ ৪

মানি মার্কেটের জের

‘মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে’

সুব্রত পোদ্দার, মেমারী, বর্ধমান, ২৫ মে •

আজ সকালে আমরা চারজন বেরিয়েছিলাম — ‘চিট ফান্ড’ কেলেঙ্কারী-পরবর্তী-সময়ে আমাদের সাতগাছিয়া বাজারের হাল-হকিকত জানতে। কথা হল প্রায় ৪০ জনের সঙ্গে। সবচেয়ে মর্মভেদী কথাটা উঠে এল হামুনপুরের সবজি বিক্রেতা প্রৌঢ় বাদল সরকারের মুখ থেকে। স্থানীয় সোসাইটিতে আমানত করতে চান কি না, এর উত্তরে গোমড়ামুখে অতি সংক্ষিপ্ত ‘না’ শুনেই কেমন যেন মনে হল, ওঁর ভেতরে অনেক ক্ষোভ জমে আছে, আসলে উনি হয়তো অনেককিছুই বলতে চান। তাই কথা বলতে শুরু করলাম, বললাম — কাকা, পাশবই না হয় করবেনই না; কিন্তু কারণটা কী একবারটি জানতে পারি?

— (বেশ বিরক্তির সুরে) না রে বাবা, মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, ওইসব কোম্পানিগুলো সব শেষ করে দিয়ে গেছে ... বাদলকাকুর চোখের কোণ কি চিকচিক করে উঠেছিল? হাটুরে ওই পরিবেশে খেয়াল করিনি। তবে কথাগুলো হাহাকারের মতো শোনাল। সারদাকাণ্ড-পরবর্তী গ্রামবাংলার ছবি বেশিরভাগ এমনটাই।

যার গেছে অথবা যার যায়নি নির্বিশেষে, সকলেরই সঞ্চয় করার মানসিক মেরুদণ্ডটাই ভেঙে গেছে; অথচ এই গরিব মানুষগুলোরই সঞ্চয় করা সবচেয়ে বেশি জরুরি, গরিবি ও মহাজনী সুদের ভয়ঙ্কর ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য। কয়েক হাজার মানি-মার্কেট-ব্যবসায়ী, কর্মহীন কয়েক লক্ষ মানুষকে ‘ইজি মানি’র লোভ দেখিয়ে, সরকারি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে কোটি কোটি মানুষকে ধনে-প্রাণে-মনে ও মানে মেরে ফেলেছে। কোথাও সঞ্চয় করতে গরিব মানুষ আর ন্যূনতম ভরসা-বিশ্বাস পাচ্ছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাই সরকারের আশু কর্তব্য গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-অলিতে-গলিতে গরিব মানুষকে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী যত সংস্থা আছে, আইন পাশ করে অবিলম্বে তাদেরকে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে আনা। নাহলে খুব শীঘ্রই ভয়ঙ্কর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে!

জনবিক্ষোভে বাতিল হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশে চুটকা পরমাণু প্রকল্পের জনশুনানি

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ছবি লোকেশ মালতীর তোলা। রিপোর্ট ও ছবির সূত্র দি হিন্দু পত্রিকা এবং সংঘর্ষ সংবাদ ওয়েবসাইট, ২৫ মে •

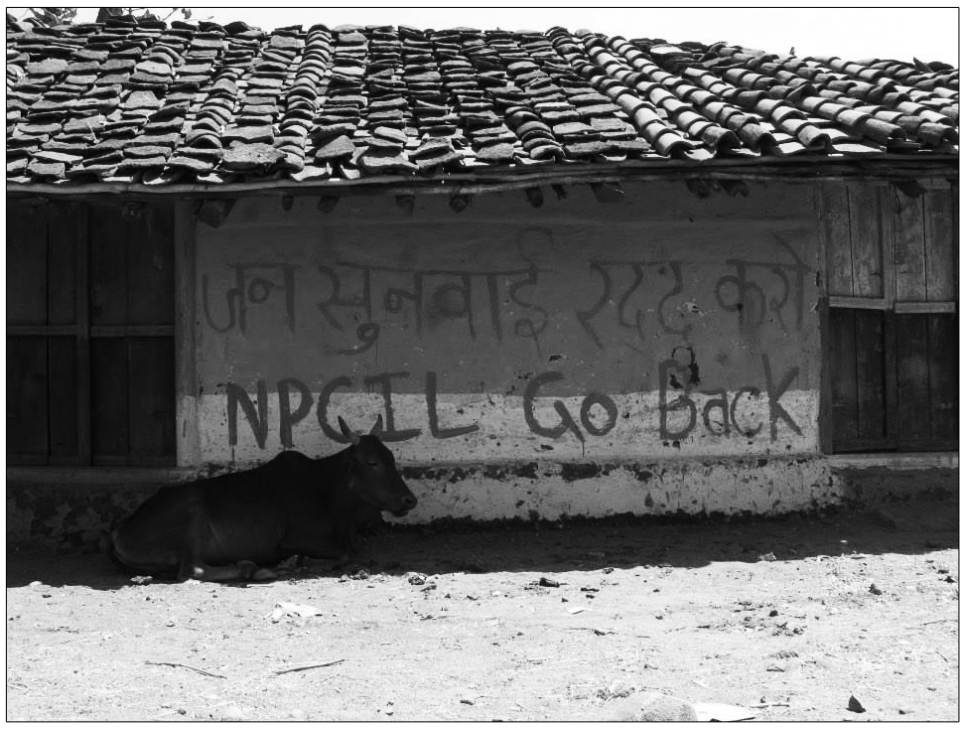

মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলা জেলায় প্রস্তাবিত ১৪০০ মেগাওয়াটের চুটকা পরমাণু প্রকল্পের জন্য জনশুনানি হওয়ার কথা ছিল ২৪ মে। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে তা ভেস্তে গিয়েছে। জনশুনানির আগে জেলা প্রশাসন অনির্দিষ্টকালের জন্য জনশুনানি স্থগিত ঘোষণা করে। ২৪ মে বিজয়মিছিল বের করে ৩৮টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা। এই গ্রামবাসীরা বেশিরভাগই গোন্দ জাতির। এই মিছিলে পরমাণু প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীরা উপস্থিত ছিল। এই প্রকল্পটির কথা ১৯৮০-র দশক থেকে বলা হচ্ছে। ২০০৯ সালে এনপিসিআইএল এই প্রকল্পের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দেয়। নারায়ণগঞ্জ তহশিলে নর্মদা নদীর ধারে ৫০০ হেক্টর জায়গা ঠিক হয় পরমাণু প্রকল্পের জন্য।

১৯৮৪ সালের বারগি জলাধার প্রকল্পের জন্য উদ্ধার হওয়া হাজার হাজার গোন্দ প্রজাতির মানুষ নর্মদা নদী দিয়ে নৌকা চালিয়ে চলে এসে চুটকা, তাতিঘাট, কুনদা, মানেগাঁও-এর আদিবাসীদের সাথে যোগ দেয় চুটকা পরমাণু প্রকল্পের বিরুদ্ধে মিছিলে। পাশের সেওনি জেলায় উচ্ছেদ হয়ে ঠাঁই পাওয়া এই আদিবাসীরা তাদের ক্ষোভ উগরে দেয়। জানায়, মা নর্মদা নদী এই পরমাণু প্রকল্প চায় না। যদি এটা হয়, তাহলে আমরা সবাই ডুবে যাব। ভালো হয়েছে ওরা চলে গেছে। আজ আমি কিছু খাইনি, তবু আমার নাচতে ইচ্ছে করছে — বলেন ১৯৮৪-তে উচ্ছেদ হওয়া রাধাবাঈ। ১৯৮০ র দশকে তাঁর ১৯ একর জমির জন্য তিরিশ হাজার টাকার মতো পেয়েছিলেন রাম সিং (৭০)। তাঁর কথায়, আমরা পাখির মতো এ জায়গা থেকে ও জায়গা উড়ে বেড়িয়েছি খাদ্যের সন্ধানে। উদ্বাস্তুদের নৌকা মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পূর্বতন গণ্ডোয়ানা গণতন্ত্র পার্টির নেতা মহতলাল বারকাদে। এছাড়া ছিল সিপিআইএমএল-এর কে এন রামচন্দ্রন গোষ্ঠীর কর্মীরা। মূল মিছিলটিতে গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চুটকা পরমাণু সংঘর্ষ সমিতি। ছিলেন সমাজকর্মী সন্দীপ পান্ডে।

মিছিল শেষে জনসভায় নিম্নলিখিত দাবিগুলি তোলা হয় :

১) এখনই চুটকা পরমাণু শক্তি প্রকল্প সহ সমস্ত পরমাণু প্রকল্প বাতিল করো।

২) ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎ কার্যক্রম স্থগিত করো। সমস্ত পরমাণু প্রকল্প বাতিল করে নিরাপদে সেগুলির ডিকমিশনিং করো।

৩) ইউরেনিয়াম খননের ওপর এখনই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করো।

৪) পরমাণু বিদ্যুৎ কার্যক্রম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করো।

৫) অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসিতার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাই এবং বিদ্যুৎ বন্টনে সমতা চাই।

৬) ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং মুনাফাবাজি না করে জন-ভাগীদারির মাধ্যমে দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ শক্তির বিকাশ চাই।

এই প্রতিবাদ ও দাবিসমূহে নিম্নলিখিত দলসমূহ উপস্থিত ছিল :

চুটকা পরমাণু সংঘর্ষ সমিতি (মধ্যপ্রদেশ), জন সঙ্ঘর্ষ মোর্চা (মধ্যপ্রদেশ), কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী (মধ্যপ্রদেশ), পিপলস ইনিশিয়েটিভ এগেইন্সট নিউক্লিয়ার পাওয়ার, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (মধ্যপ্রদেশ), অখিল ভারতীয় ক্রান্তিকারী বিদ্যার্থী সংগঠন (মধ্যপ্রদেশ), গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন (ভূপাল), মধ্যপ্রদেশ মহিলা মঞ্চ, শিক্ষা অধিকার মঞ্চ (ভূপাল), ওমেন্স এগেইন্সট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স অ্যান্ড স্টেট রিপ্রেশন (মধ্যপ্রদেশ)।

বুড়ি-মা’র কথা

রঞ্জন, কলকাতা, ২৭ মে •

১)

মেনকা দালাল।

তাঁর বয়স কত কেউ জানে না। কবে যে কলকাতায় পৌঁছলেন, সঠিক সমাচার তারও নেই। কেন না তিনি নিজেই — ভাষাহারা, মূক। হয়ত অনেকটাই বধিরও। গত শতকের আশির দশকেই তাঁকে আমি দেখেছি। দেখেছি সংস্কৃতি রাজনীতি চর্চার নহবৎখানা — কফি হাউসের বাড়ির ঢোকার মুখের গেটটির পাশে বসে থাকতে। আশপাশের ছোটো ছোটো বই-দোকানে কখনও জল এনে দিতে, কাউন্টার মুছে সাফ করে রাখতেও। সবসময় হাসিমুখ এই বুড়ি-মাকে, বহু মানুষ, ছাত্রছাত্রীই, খাবার টাকাপয়সাও না দিয়ে পারতেন না। যদিও হাত পেতে চাওয়াও ছিল না তাঁর। রাত্রিবাস ছিল কখনও কফিঘরের বারান্দায়, কখনও বন্ধ দোকানের চৌকিতে।

অনেক পরে জেনেছি — আবার পরিচয়ও হয়েছে — তাঁর এক ছেলেও আছে — মহেন্দ্র, দিনমজুর, বিপত্নীক। ঘরখানা হাসনাবাদের রেজিপুরে। কিন্তু দেশজুড়ে ছড়ানো আরও অনেক দিনমজুরের মতোই তাঁর জীবনও অনিশ্চিত, নৈরাজ্যময়, ভবঘুরে। বেঁচে থাকাটুকু অবশ্য বুড়িমার থমকায়নি সেভাবে। সে সমস্যা শুরু হয় ২০০৭ থেকে, যখন থেকে একের পর এক শারীরিক সংকটে পড়তে লাগলেন। চিকিৎসাও চলল, কখনও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে, কখনও কামারহাটির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, কখনও হাওড়ার মৌরিগ্রামের ইরিম-এ, ফের কলকাতার মানিকতলায় বাগমারীতে প্রতাপনারায়ণ রায় মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথ হাসপাতালেও। ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মাঝপর্বে প্রায় সাত বছরে ওইসব হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন বুড়ি-মার দু-মাস থেকে এমনকী কাছাকাছি বছরখানেকও ছাদের নিচে বাস আর দু-বেলা সুনিশ্চিত আহারের সুযোগও মিলে যায়।

ভাঙা শরীরে আহার আর বসবাসের একটু নিশ্চয়তা দেবার জন্য বুড়িমাকে প্রথমে নিয়মিত অর্থসাহায্য আর চিকিৎসা সহায়তার বিনিময়ে বেলঘরিয়ার ভগবতী চ্যাটার্জি স্ট্রীটের এক পশুপালক পরিবারে আবার চেতলাতে ‘ঈশ্বর সংকল্প’ নামে একটি মহিলা আশ্রয়কেন্দ্রেও থাকার বন্দোবস্ত করি। ২০১২-র জুলাই মাসের পর তাঁর নতুন ঠিকানা হয় কল্যাণীর ‘লোকনাথ সেবাশ্রম’।

এই ৫-৬ বছর সময়পর্বে বুড়িমা ভুগেছেন অর্শ, কিডনির অসুখে। কফিহাউসের সিঁড়ি থেকে পড়ে ছোট্ট একটা স্ট্রোকও হয় তাঁর। এইসব অসুখেরই চিকিৎসা করা ও উপশম করা অনেকদূর পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।

বয়সজনিত কারণে আর কথা বলতে না পারার কারণেও তাঁর নিত্যকর্মগুলির জন্য একজন আয়াও রাখতে হয়েছে — গত প্রায় একবছরের কাছাকাছি সময়। এসবের জন্য মাসিক প্রায় সাড়ে ন-হাজার টাকা অর্থ সংকুলান করতেই হয়। তা করে যেতেও হবে যতদিনই তিনি বেঁচে আছেন।

বেশ কিছু মানুষ এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, করছেন। কিন্তু আরও সহায়তা এবং একটা নিয়মিত সহায়তা ব্যতিরেকে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া দুরূহও হয়েছে বরাবরই।

২)

বৃদ্ধাশ্রম — লোকনাথ সেবাসদন। কমবেশি জনা দশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত। একটা বাড়ির একতলায় আশপাশের অন্যান্য বৃদ্ধাশ্রমের তুলনায় অনেক স্বল্পব্যয়ের। এখানে আলাদা করে কোনো ডিপোজিট মানি জমাও দিতে হয় না। মাসের আগাম খাওয়া-থাকার খরচা ছাড়া। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতির অভাবে পরিষেবার কোনো পরিকাঠামোই নেই। আবাসটির স্বত্তাধিকারিণীই পরিচালনা থেকে দেখভাল, বাজার, খাবার তৈরি করা, পরিবেশন — একলাই করেন। সংস্থাটি রেজিস্টার্ড এবং বার্ষিক হিসাবপত্রও যথাযথ থাকার পর নানারকম আবেদনেও — সরকার বা কোনো এনজিও বা ব্যক্তির অনুদান মেলেনি। একটা ঘরে থাকেন তিনজন মহিলা। অন্যঘরে বাকিরা পুরুষ। এখন দু-জনই আবাসিকা বয়স্ক, অশক্ত এবং বয়সজনিত নানা রোগেও ভুগছেন। থাকা-খাওয়াটুকু ছাড়া — নেই কোনো বিনোদনও।

এরপর দুয়ের পাতায়

ইকোলজি প্যানেলের রিপোর্টকে বদলে পশ্চিমঘাট ধ্বংসে উদ্যোগী কেন্দ্র

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং বনাঞ্চলের পরিবেশ বাঁচানোর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের তলবের ভিত্তিতেই ২০১১ সালের আগস্ট মাসে ইকোলজিক্যাল এক্সপার্ট গ্রুপ একটি রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্টকে কাটাছেঁড়া করার জন্য কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক। কস্তুরীরঙ্গনের কমিটি আগের মাধব গ্যাডগিল কমিটির তৈরি করা রিপোর্ট নস্যাৎ করে দিয়ে যেটি বানিয়েছে, সেটি পশ্চিমঘাট বনাঞ্চলকে বাঁচাতে নয়, ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। নিচে কস্তুরীরঙ্গনকে লেখা মাধব গ্যাডগিলের চিঠি •

ডঃ কস্তুরীরঙ্গন মহাশয়

উনিশ শতকের সম্মানিত বিজ্ঞানী জে বি এস হ্যালডেন সুয়েজে ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদ করে ওই দেশ ছেড়ে এসে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : বাস্তব কেবল আমাদের অনুমানের চেয়ে অজানাই নয়, বরং আমরা যতটা অনুমান করতে সক্ষম তার চেয়েও অজানা! আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে আপনারা ‘হাই লেভেল ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ওয়েস্টার্ন ঘাট’-এর মতো একটা রিপোর্টের অংশীদার হতে পারেন!

আমাদের ব্যাপক আলোচনা ও ক্ষেত্র-পরিদর্শনের ভিত্তিতে আমরা পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেছিলাম, তাতে আমরা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল পশ্চিমঘাটকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি ধাপে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছিলাম, যার মধ্যে তৃণমূল স্তরে কিছু জোগান দেওয়ার ভূমিকাই ছিল প্রধান। আপনারা এই কাঠামোটাকে বাতিল করেছেন এবং তার জায়গায় একটা ভাগাভাগির সুপারিশ করেছেন, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ — যাকে আপনারা বলেছেন প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য — রক্ষা করবে বন্দুক এবং পাহারাদারেরা; বাকি দুই-তৃতীয়াংশ হল তথাকথিত সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য। সেটা ছেড়ে রাখা হবে উন্নয়নের জন্য, যেমনটা প্রসব করেছে গোয়ার ৩৫০০০ কোটি টাকার বেআইনি মাইনিং কেলেঙ্কারি। এর অর্থ হল পরিবেশ ধ্বংসের মরুভূমিতে বৈচিত্র্যের মরুদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ করা। বাস্তুতন্ত্র আমাদের শিখিয়েছে, এই ধরনের ভাগাভাগির ফলে অনতিবিলম্বে মরুদ্যানকে গ্রাস করবে মরুভূমি। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, প্রাণী ও গাছপালার স্বাভাবিক আবাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং পরিবেশ ও সমাজ বান্ধব ছাঁচের ভাবনা যাতে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকাগুলির সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয় এবং এটাই আমরা প্রস্তাব করেছিলাম।

উপরন্তু, টাটকা জলের জীববৈচিত্র্য অরণ্যের জীববৈচিত্র্যের তুলনায় অনেক বেশি বিপন্ন এবং সেটা রয়েছে মূলত আপনাদের ভাষায় সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের মধ্যে। টাটকা জলের জীববৈচিত্র্য আমাদের জনসমাজের বৃহৎ অংশের জীবিকা ও পুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে আমরা মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলায় লোটে কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্সের বিশদ নমুনা সমীক্ষা উপস্থাপন করেছি। সেখানে দূষণের মাত্রা সমস্ত আইনি সীমা অতিক্রম করে ফিশারিগুলিকে ধ্বংস করেছে, যার ফলে ২০,০০০ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, মাত্র ১১,০০০ মানুষ শিল্পে কর্মসংস্থান পেয়েছে। তথাপি সরকার সেই এলাকায় ফের দূষণকারী শিল্প স্থাপন করতে চাইছে। অতএব সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ‘জোনাল অ্যাটলাস ফর সিটিং অব ইন্ডাস্ট্রিজ’-কে চেপে যেতে চাইছে।

আমরা মর্মাহত যে আপনাদের রিপোর্ট আমাদের সংবিধান-রক্ষিত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার গণতান্ত্রিক হস্তান্তরকে নাকচ করতে চাইছে এই বলে যে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের কোনো ভূমিকা নেই। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আপনাদের রিপোর্ট আমাদের রিপোর্টে পেশ করা তথ্যকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। অথচ সরকার লোটের বেআইনি দূষণের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, পুলিশের ক্ষমতার জোরে ২০০৭-০৯ সালে ৬০০ দিনের মধ্যে প্রায় ১৮০ দিনের সম্পূর্ণ ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

সম্পাদকের কথা

শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট!

বালিগঞ্জ স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের অপেক্ষায়। দূর থেকে দেখছি একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে আসছে ওর বাবার হাত ধরে, পাশে ওর মা। দেখতে শান্তশিষ্ট মেয়েটা, গায়ে ধবধবে একটা ফ্রক, পায়ে জুতো, দিব্যি হেঁটে আসছিল ও। আমার কাছাকাছি এসে ওর নজরে পড়ল একটা গর্ত মতো জায়গায় কিছুটা জল জমে রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই মেয়ে বাবার হাত ছাড়িয়ে জলটার ওপরে লাফিয়ে উঠল। চারদিকে জলটা ছিটকে উঠল, ওর গায়ে জামায় কিছুটা ছিটকে গেল সেই কাদামাখা জল। শান্তশিষ্ট মেয়ের মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। চারপাশে অপেক্ষমান জনতা এই আচমকা জলোচ্ছ্বাসে চমকে উঠল। ওর বাবা মেয়ের কাণ্ড দেখে তাড়াতাড়ি আবার ওকে টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে বন্দি করলেন। তবে তিনিও মেয়ের এই আচমকা কাণ্ডে একটু কৌতুক অনুভব করলেন, এক চিলতে বাঁকা হাসি দেখা গেল ওঁর মুখে। মা কিন্তু রেগে গজগজ করতে শুরু করলেন।

প্যাসেঞ্জাররা শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট ছোট্ট মেয়েটার এই খেলায় সত্যিই বিরক্ত হল। কিন্তু ওর দিকে নজর করতে করতে দেখল, মেয়েটা নিজের কাণ্ডটা মাথা নেড়ে উপভোগ করতে করতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে গেছে অনেকটা।

আমাদের গতানুগতিক একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনকে এইভাবে আন্দোলিত করে একটা তরতাজা গণ-আন্দোলন। যেমনটা ঘটল গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের শাহবাগ স্কোয়ারে। দল-মিডিয়া-সরকার-পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী নামক গুচ্ছের অভিভাবকদের হাত ছেড়ে দিয়ে তরুণ-তরুণীদের আচমকা একটা ঢেউ তুলে দেওয়ায় অনেকেই বিরক্ত হয়েছে। শাহবাগে নতুন প্রজন্মের ক্ষণিকের সেই আলোড়ন মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

শ্রমজীবীর পাঠশালার খবর — নতুন পড়া নতুন ধাঁচে

সুমিতা সরকার, শেওড়াফুলি শ্রমজীবী হাসপাতাল, ২৭ মে •

গত তিন মাস ধরে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে শেওড়াফুলি শ্রমজীবী হাসপাতালের দুটি ঘরের বেশ কয়েকটি কচি কচি মনের মধ্যে। হুগলী বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর পুরুলিয়ার গ্রামগ্রামাঞ্চলের এগারো বারো তেরো বছরের চব্বিশটি কিশোর-কিশোরী জানছে যে পড়াশোনার সঙ্গে আনন্দেরও যোগ আছে; হাসতে হাসতেও পড়াশোনা করা যায়; ক্লাসে কথা বললে কেউ ধমকে চুপ করিয়ে দেয় না, বরং প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেন মাস্টারমশাই দিদিমনিরা। লেকচার দিয়ে পড়ানো নয়, বরং বিষয়কে ঘিরে একটা সমস্যার অবতারণা করে পড়ুয়া-গুরুমশাই সবাই মিলে সেই সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করা — এটাই এই ক্লাসের মূল লক্ষ্য। উত্তর খুঁজে বের করতে করতে পড়ুয়ারা শিখবে কী করে ভাবতে হয়। এই পাঠশালার গুরুমশাইদের মূল কাজ তাই পড়ুয়াদের চিন্তা করতে শেখানো, সব কিছুকে প্রশ্ন করতে শেখানো, কোনো কিছুকেই যেন তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে না নেয়, সবকিছুকেই যেন যুক্তি-বুদ্ধি-হৃদয় দিয়ে বিচার করে নেয় — এটাই এই পাঠশালার প্রধান পাঠক্রম। একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে এখানে আমার অভিজ্ঞতা জানাই।

আমি প্রথমে ওদের সঙ্গে জানাশোনা শুরু করি গান শেখানোর মাধ্যমে, ফলে আমাদের পরিচয়টা খুব সহজ ও নিঃসংকোচ হয়। ওরা সহজেই আমাকে গানের দিদি হিসেবে কাছে টেনে নেয়। ফলে তার পরের সপ্তাহে যখন আমি ওদের বাংলা পড়াতে শুরু করি তাতে প্রথমে ওদের একটু আপত্তিই ছিল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ এখন আমাকে বাংলা এবং গান দুটি ক্লাসই নিতে হয়। বর্তমানে যে ক্লাসটি হচ্ছে তার পাঠশব্দ হল 'বারুদ'।

বারুদ-সম্পর্কিত তিনটি ছবি প্রথমে দিলাম ওদের। বললাম, কী আছে বল তো প্রথম ছবিটায়? প্রথমে বলল রুদ্র, তারপর দীপা — একটা বড়ো খোল, তার মধ্যে থেকে যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো বেরোচ্ছে, ওগুলো 'গুলি'। ওখান থেকে শব্দ এল 'বুলেট'। অন্যরা নানা মত দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল গুলির মধ্যে থেকে বারুদ বেরোচ্ছে। রুদ্র আর শান্তি বুলেটের ছবি এঁকে দেখালো। মাঝের ছবিটা থেকে 'কামান' এলো সহজেই। সেখান থেকে 'গোলা'। কী করে গোলা ছোঁড়ে সেই নিয়ে খানিক আলোচনা হল। 'যুদ্ধ' এল। যুদ্ধের সিনেমা এল। বুদ্ধদেব একটা সিনেমার গল্প বলছিল যেখানে হিরো প্রচুর কামানের গোলার মধ্যেও কিছুতেই মরল না। অপর্ণা ছিল বিষ্ণুপুরের মেয়ে, ও দলমাদল কামানের কথা বলল। আমি ওদের দলমাদল কামানের গালগল্প এবং তার সম্ভাব্য যুক্তিগ্রাহ্য কাহিনিটা বললাম। এরপর তৃতীয় ছবিটায় শব্দ এল 'তুবড়ি', হেমন্ত তার সাঁওতাল ভাষার প্রতিশব্দ বলল 'ছ্যারছ্যারে'। এর থেকে এল 'বাজি'। 'পটকা'। 'পটাকা', হিন্দি শব্দ। শেষমেশ এল 'বিস্ফোরণ'। এই শব্দটার বানান আমি ওদের বলে দিইনি, বলেছি তোদের খুঁজে বার করতে হবে। ওরা অনেক চেষ্টা করেছে, এটা ওদের বাড়ির কাজ দিলাম।

বারুদ নিয়ে সাধারণ আলোচনার পর আমরা গেলাম যুদ্ধে। সেখান থেকে যুদ্ধ ভালো না খারাপ। শান্তি আর সুদীপের মতে স্বাধীনতার যুদ্ধ অবশ্য ভালো। তারপর যখন যুদ্ধর সামাজিক দিকটা একটু বলার চেষ্টা করলাম, আসলে যুদ্ধে কার লাভ হচ্ছে? বলল, এক রাজা আরেক রাজ্য দখল করছে। তাতে কার লাভ হচ্ছে? কেন, ওই রাজ্যের লোকের? ভারত আর পাকিস্তানের যুদ্ধে ভারত যে জিতল, তাতে ভারতের সাধারণ মানুষের কী লাভ হল? নীরবতা। একটা দেশ আর একটা দেশ দখল করলে সেই দেশের না খেতে পাওয়া লোকগুলো কি খেতে পায়? দুই দেশের যে সৈন্যরা মরে তাদের বাবা-মায়েদের কাছে কি যুদ্ধ ভালো? সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গেল। তাহলে যুদ্ধে কার লাভ হয়? অনেক গুলি-বন্দুক বিক্রি হয়। কামান। যুদ্ধজাহাজ। যুদ্ধবিমান। তাহলে লাভ হয় দোকানদারদের। এটা ওরাই বলল। তারপর ওরা নিজেরাই বারুদ নিয়ে একটা টেক্সট লিখেছে প্রত্যেকে। পরের দিন ওগুলো মিলিয়ে ওর থেকে বেছে একটা টেক্সট তৈরি করতে হবে। ওদের নিজেদের তৈরি করা টেক্সট পড়তে ওরা উৎসাহ পাবে বলেই আশা করি। সব মিলিয়ে আজ আমার পড়িয়ে খুব তৃপ্তি হয়েছে।

এই নতুন পাঠদানের পথিক হয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় জনা তিরিশেক শিক্ষাব্রতী। প্রতিদিন নিয়ম করে রুটিন ধরে এই শিক্ষাব্রতীরা আবাসিক পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেন। হাসপাতালের পাশেই নতুন একটি বাড়িতে পড়ুয়াদের আস্তানা, দোতলায় মেয়েরা এবং তিনতলায় ছেলেরা। মেয়েদের ঘরের বাইরে লম্বা টানা ক্লাসঘর। আলোয় হাওয়ায় পরিপূর্ণ বাড়িটি ভরে থাকে এতগুলি ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি খেলাধুলা ছোটাছুটি গান এবং কখনও কখনও খুনসুটিতেও। বাড়ির জন্য শান্তনুর মন খারাপ হলে অমিয় এসে কাঁধে হাত রাখে। শান্তির জ্বর এলে দীপা দিদির মতো কপালে জলপটি দেয়। কিন্তু বন্ধুত্বের হাতটা এখানেই থেমে থাকে না। ছোট্ট ফকির পড়াশোনায় পিছিয়ে-পড়া বলে ওর দলের ছেলেমেয়েরা ওকে আলাদা করে পড়িয়ে ওকে নিজেদের সমান করে নিয়েছে। আর এখানেই এই পাঠশালা সার্থক হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা একে অপরের দুর্বলতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, যা একদিন তাদের গড়ে তুলবে সমাজের এক একজন সহমর্মী মানুষ হিসেবে, এটাই এই শ্রমজীবী পাঠশালার আসল উদ্দেশ্য। একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে আশা করব সেই উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।

চলতে চলতে

'দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন, মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি'

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ৩০ মে •

কাল রাত থেকে ইলশেগুঁড়ি। আজ সারাদিন আকাশ ঝরছে। বাদলা হাওয়ায় দোতলার ফাঁকা ঘরে ধাঁই ধাঁই করে দরজার কপাট পড়ছে। ওরা চলে যাওয়ার সময় ভিতরের দরজা ভালো করে লাগায়নি। হঠাৎ হঠাৎ দরজার পাল্লা মাথার ওপর ধড়াম করায় চমকে উঠছি। এমনিতে বন্ধু দিলীপ আত্মহত্যা করায় মনটা খুব নরম হয়ে পড়েছে। তারপর মেঘে ঢাকা দিনের চোখ বোজা আলো পরিবেশ আরও থমথমে করে তুলেছে। সঙ্গে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দরজার শব্দ।

গোপালনগর পোস্ট অফিসে গেলাম ২৫ পয়সার স্ট্যাম্পের খোঁজে। যথারীতি নেই। কলকাতায় কোনো পোস্ট অফিসেই পাওয়া যাচ্ছে না। জিপিওতেও নয়। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেছি — কেন দিলীপ ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিল, এই ৫৭ বছর বয়সে কীসের ভয়, কত দুঃখ — আত্মহত্যাকারীর মন আমরা উপলব্ধি করতে শিখিনি, তাহলে তো ঠেকানোই যেত। দুদিন বাদে হয়তো এমনিই মরত, কেন নিজের থেকে মরতে চাইল কিছুই বোঝা গেল না — ভাবতে ভাবতে প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে এক এসবেস্টসের চালাওয়ালা ফাঁকা একতলার বারান্দায় এক খুনখুনে বুড়িকে আতস কাচের চশমা পরে পা ছড়িয়ে বসে একা একা ঝোলা থেকে কলা বার করে মুখে পুরতে দেখে ফুটপাথ থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। সামলে নিতে নিতে, ওপার থেকে এপারে আসছিলেন এক দিদি — তিনি বললেন, লাগল? আমার দিদির মতোই লাগল দেখতে। 'না' বলে হেসে কালীঘাট ব্রিজে উঠে দেখি উলটপালট হাওয়া ছাতা মাথায় রাখতে দেবে না। তাই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই ফিরলাম পটুয়া পাড়া দিয়ে।

সেখানে মোড়ে আধপুরোনো বাড়ি অর্ধেক ভাঙ্গা পড়েছে। পরপর দোকানে বল-প্রেস মেশিন, স্যাঁকরার কারিগরি সব যেন অকালবৃষ্টিতে থমকে আছে। বাঁদিকে 'চুলের জন্য পুষ্টির ভিটামিন সমৃদ্ধ এলীন কেশতৈলর' রংচটা পুরোনো বিজ্ঞাপনের নিচের দোকানে অন্ধকার বিস্কুটের বয়ামের ওপাশে একজন বসে মাছি তাড়াচ্ছে। ডানদিকে শিবের বুকের ওপর কালীর কাঠামো উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে মাথা নিচু করে দুটো পুলিশ টিনের চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। 'ওলা, তুই চটি কোথায় ফেললি?' বলে ফুটপাথে বসা মেয়ের মা ছুটে এসে একপায়ে চটি পরা ছোট্ট মেয়েকে কোলে তুলে চটি খুঁজতে ছুটল। মেয়েটার দুপায়ে মল, তাও ভালো, মল হারায়নি দেখলাম। দেখতে দেখতে বাড়ি পৌঁছে দরজাতেই শুনি বউয়ের গলা, 'এই দেখো ঋতুপর্ণ ঘোষ, সিনেমাপরিচালক, মারা গেছেন। টিভিতে দেখাচ্ছে, মাত্র ৪৯ বছর বয়স, ঠিক আমার বয়সি, দেখো ১৯৬৩ সালে জন্ম। মনটা খুব খারাপ লাগছে। একটা গুণী লোক চলে গেল।' দেখে শুনে আবার দিলীপের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ে গেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা নাজিম হিকমতের কবিতার লাইন, 'দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন, মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি'।

ভারত-জাপান পরমাণু সমঝোতা বন্ধ করো! পরমাণু রপ্তানি নীতি থামাও!

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখন জাপান সফরে, সে দেশের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটি দেশের সরকারকে লক্ষ্য করে এই চিঠি। এই চিঠিটি সই করেছেন কুডানকুলামের পরমাণু প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সহ পৃথিবীর অনেক সচেতন মানুষ, ২৮ মে •

আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীরা এই পৃথিবীর সচেতন নাগরিক। আমরা ভারত এবং জাপানের মানুষের সমর্থনে এই চিঠি লিখছি।

আমরা ভারত-জাপান পরমাণু সমঝোতা, যা নিয়ে এখন তীব্র দরকষাকষি চলছে, তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। দুটি দেশেরই সরকারের উচিত পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ধ্বংসকারী পরমাণু বাণিজ্য থেকে সরে আসা।

জাপানের ফুকুশিমা দুর্ঘটনা থেকে ভারত সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং বোঝা উচিত যে এই পরমাণু প্রযুক্তি ব্যাপক ঝুঁকির। পরমাণু বিপর্যয় মানুষ এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে। ফুকুশিমা দুর্ঘটনার দু-বছরেরও বেশি সময় পরেও সেখানকার চুল্লিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি এবং ভূমি, বায়ুমণ্ডল ও জল দূষিত হয়ে চলেছে তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে। এর ফল ভুগছে এই প্রজন্ম, আগামী প্রজন্মও এর ফল ভুগবে। নীতি নির্ধারক এবং পরমাণু ইন্ডাস্ট্রিওয়ালাদের অপরাধ-চক্র বেআব্রু হয়ে গেছে।

ভারতকে অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং তার পরমাণু শক্তির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। পরমাণু শক্তি এখন ৩ শতাংশেরও কম বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। তাকে অতি সহজে প্রতিস্থাপিত করা যায় পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং সহনযোগ্য বিকল্পগুলি দিয়ে।

আর জাপানেরও অন্যান্য দেশে পরমাণু প্রযুক্তি রপ্তানি করা বন্ধ করা উচিত। বিশেষত সেই সব দেশের কাছে, যারা এনপিটি এবং সিটিবিটি-তে সই করেনি। ভারত, ভিয়েতনাম, জর্ডন প্রভৃতি দেশে পরমাণু শক্তি রপ্তানি করার বর্তমান নীতিটি অন্যায্য, যখন জাপান নিজেই ফুকুশিমার মাধ্যমে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং জাপানি নাগরিকরা বিশাল বিশাল মিছিল করে চলেছে পরমাণু-মুক্ত ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য। তিনটি চুল্লির মেল্টডাউনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ এখনও হয়ে ওঠেনি।

বাচ্চাদের জন্য, মহিলাদের জন্য এবং ভারত ও জাপানের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, এই পৃথিবীর জন্য, আমরা জাপানের পরমাণু রপ্তানি নীতির স্থগিতাদেশ চাইছি এবং ভারত-জাপান পরমাণু সমঝোতার অবসান চাইছি, এক্ষুনি।

প্রথম পাতার পর

বুড়িমা'র কথা

এখানেই বুড়িমার ঠিক উল্টোদিকেই শয্যা শ্রীমতি রীনা সেনের। পাঁচ-ছ বছরের বাসিন্দা। ৭৫ পেরিয়েছেন। খাওয়া কমছে, মলমূত্র ত্যাগেও নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। ছেলে-মেয়ে সকলে প্রতিষ্ঠিত চাকুরে — কেউই মায়ের খোঁজ নেয় না। চাকরি জীবনের পেনশনটুকুই তোলেন আবাসের অধিকারিনী — তাঁর খাওয়া আর থাকাটুকু চলছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ক্রমাগতই শয্যাঠাঁই হয়ে পড়ে থাকেন — দিনরাত। স্মৃতি লোপ পেতেও শুরু করেছে। ছেলেমেয়েদের নম্বরে ফোন করলে তাঁরা ফোনও ধরেন না। রীনা সেন এখনও পড়তে ভালোবাসেন। আগে তাঁর বেশ কিছু নিয়মিত ওষুধ চলত শারীরিক কারণে। বাড়ির মানুষজন সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করার পর সেসবও বন্ধ হয়েছে। কলকাতার টবিন রোডে (বরানগর) বাড়ি ছিল এঁর। আশ্রমের স্বত্ত্বাধিকারিনী বনলতাদি চান — সহৃদয় কোনো চিকিৎসক যদি রীনাদি এবং আবাসের অন্যান্য আবাসিকদেরও প্রতিমাসেই কিছুটা নিয়মিত চিকিৎসা-সহায়তা করেন।

৩)

শ্যামবাজার মেট্রো পথের সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখেই, তাঁকে প্রায় নুইয়ে পড়া অতিশীর্ণ দেহে বসে ভিক্ষে করতে হয়তো দেখেছেন অনেকেই। বয়স যত বাড়ছে শরীর আরও কমজোরী। ক-দিন আগেই ভর্তি হতে হয়েছিল আরজিকর হাসপাতালে। একা একাই বাস — ক্যানাল ইস্ট রোডের খালপাড়ের ঝুপড়িতে। খাল-সংস্কার শুরু হওয়ায় — এখন সে ঝুপড়িও গেল। এখন এ মন্দির ও মন্দিরের দালান-ঠাঁই এই বুড়িমার। ঘর ছিল কাটোয়ার গোপালপুরে, সেখানে ছোটো মেয়ে থাকে — একটু টাকাপয়সা জমলেই পাড়ি দেবেন সেখানে — মনের এই ইচ্ছে, নইলে এখানে ঘর কই? ৪০০ টাকাতেও ঝুপড়ি বস্তির ঘর মেলে না। এত বয়সে এখনও ঠিকানা খোলা আকাশের নিচের ফুটপাথ আর সইতেও পারেন না। ফুটপাথের জীবনের অন্ধকার কত মুখ বুজে সওয়া যায়?

এইরকম মানুষ — এক নয় অসংখ্য। তবু যে রাষ্ট্র এদের দায় নেয়নি, সমাজও তারই সঙ্গে তাল ঠুকবে এমন অভিপ্রায়ে ভাবতে হবেই আমরাও কি তাল মেলাবো? সেটা কতদূরই বা মনুষ্যোচিত হবে?

কেবলই ব্যক্তিগত হতে হতেও কি পারা যাবে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত জীবনের পরিণতি এতটুকুও এড়াতে?

পুলিশ হেফাজতে নিহত অভিযুক্ত, প্রতিবাদ

২০০৭ সালে গোরখপুর কোর্ট চত্বরে একটি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত খালিদ মুজাহিদ নামে এক যুবক গত ১৫ মে শনিবার পুলিশ হেফাজতে মারা যায়। ফৈজাবাদ আদালতে শুনানি সেরে লখনৌ জেলে পুলিশ ভ্যানে ফেরার পথে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ দাবি করে মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ। যদিও অটোপ্সি করার আগের কিছু ফটোতে দেখা যায়, খালিদের গায়ে অত্যাচারের চিহ্ন। ২১ মে আদালত চত্বরে খালিদের অন্যতম আইনজীবী মোহাম্মদ শাকিলকে বেধড়ক পেটায় কিছু আইনজীবী। খালিদের 'খুন'-এ দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবিতে লখনৌ বিধানসভার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসে রিহাই মঞ্চ নামে একটি সংগঠন, যারা বিনা দোষে সন্ত্রাসবাদী অভিযোগে জেলে আটক মুসলিম যুবকদের পক্ষে সওয়াল করে আসছে। সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৭ মে। তথ্যসূত্র মুসলিম মিরর, ছবিসূত্র রিহাই মঞ্চ-এর ফেসবুক পেজ।

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমঘাট ধ্বংস

ভারতের সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য বহু মূল্যবান জীববৈচিত্র্যের উপাদান হাজির করেছে। পশ্চিমঘাটে আবদ্ধ লায়ন-টেইল্ড ম্যাকাক্ নামক বানর প্রজাতির পুরো ৭৫% চাবাগানের সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যে বেড়ে উঠেছে। আমি পুনে শহরে বাস করি। আমার এলাকায় বহু অশত্থ-বট, পিপুল ও গুলার গাছ ছড়িয়ে রয়েছে; জেনাস ফিকাস প্রজাতির এই গাছগুলির মর্যাদা আধুনিক বাস্তুতন্ত্রে এক মূল উৎস হিসেবে, যা অন্য প্রজাতির বিপুল বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে। সারা রাত আমি ময়ূরের ডাক শুনতে পাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি রাস্তায় গেলে দেখতে পাই, ওরা নাচছে। আমাদের দেশের মানুষ, ভারতের শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যাদের শেকড় রয়েছে, তারা প্রকৃতিকে সম্মান করে। তারা পবিত্র বৃক্ষ, ফিকাস প্রজাতির গাছ, বানর ও ময়ূরকে শ্রদ্ধা করে এবং রক্ষা করে।

আপাতভাবে এসব কিছুকেই ছেঁটে ফেলা হবে। এটা আমায় ফ্রান্সিস বুচাননের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ঘোষিত প্রতিনিধি ১৮০১ সালে লিখেছিলেন, ভারতের পবিত্র বৃক্ষগুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তির অধিকারের দাবিকে আটকানোর ফন্দি ছাড়া কিছু নয়।

আজ মনে হচ্ছে, আমরা এখন ব্রিটিশের চেয়েও বেশি ব্রিটিশ এবং আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের প্রতি একটা প্রকৃতি-বান্ধব দৃষ্টি কেবল দেশের ধনী ও ক্ষমতাবানদের এবং বিশ্বায়িত পৃথিবীর সমস্ত জমি ও জলকে দখল করে নিয়মহীন, কর্মহীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে কায়েম করে নিজেদের ইচ্ছে মতো শোষণ ও দূষিত করা আটকানোর ফন্দি ছাড়া কিছুই নয়। আমরা বিস্মিত যে আপনাদের রিপোর্ট সেই মনোভাবকেই কঠোরভাবে সম্মতি দিচ্ছে। সত্যিই বাস্তব আমাদের ধারণার চেয়ে বেশি অজানা।

মাধব গ্যাডগিল

শিক্ষিত সমাজও মানি মার্কেটের গুড় খেয়েছে

রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ৩০ মে

কোচবিহারে একের পড় এক চিট ফান্ড সংস্থায় তালা ঝুলছে । নতুন সংযোজন ব্লু শাইন কোম্পানি। তরাই, ডুয়ার্স, নিম্ন আসাম জুড়ে এদের ব্যবসা। গত ২৩ মে কোচবিহার টাকা গাছের শঙ্করী রায় জমানো দশ হাজার টাকা তুলতে গিয়ে অফিসে তালা বন্ধ দেখেন। কোচবিহার কোতোয়ালী থানায় অভিযোগ জানান। এরপর সকল আমানতকারি কোচবিহারে অফিসের সামনে কান্নায় ভেঙে পরে, ডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু আমানত? গ্রামে, শহরতলিতে হঠাৎ একটা আর্থিক প্রতারণার সুনামী আছড়ে পড়েছে।

এসব জাঁকিয়ে বসতে নেতা মন্ত্রীদের পাশাপাশি আমাদের ভূমিকা কেমন ছিল? তার একটা টুকরো ছবি তুলে ধরছি। রয়াল গ্রুপ অফ কোম্পানিস নামক চিট ফান্ড সংস্থার জন্ম কোচবিহারে। ব্যবসা উত্তরবঙ্গ এবং আসাম জুড়ে। রমরমা ব্যবসা। দীর্ঘ লাইন দিয়ে টাকা জমা পড়ছে। বছরের শুরুর দিকে হঠাৎ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার মারা গেলেন। সংস্থা উঠে যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হল। মানুষের মনে আস্থা কমছে। সবাই আমানত তুলে নেবে কিনা ভাবছে। ঠিক এই সময়েই কোম্পানির উদ্ধার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হল কোচবিহার 'স্কেটেড নাট্যোৎসব'।

৩-৫ এপ্রিল, ২০১৩ কোচবিহারে 'স্কেটেড নাট্যোৎসব' হয়ে গেল। টিকিট ১৫০ টাকা। কোচবিহার রবীন্দ্রভবন চত্বর রয়াল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ্-এর বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনে মুড়ে ফেলা হয়েছে। নাটক শুরু হওয়ার আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বলতে রয়াল গ্রুপ কোম্পানিজের সদ্য প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতার বৃহৎ প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রতিকৃতির সামনে রাখা পঞ্চ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন মঞ্চে উপস্থিত দিনহাটা সদর হাসপাতালের ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য (যাঁকে উত্তরের বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলে সঞ্চালক পরিচয় করিয়ে দিলেন) সহ সকল অতিথি বর্গ। হলের কানায় কানায় পূর্ণ দর্শককুল অর্থাৎ কোচবিহারের অন্যান্য নাট্য দলের কর্মী, স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা সহ একেবারে সচেতন অংশ আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনকে সম্মানিত করে।

উদ্বোধনীর দিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল ২০১৩ তে নাটক ছিল কলকাতার সোনারপুর কৃষ্টি সংসদ-এর 'মুক্তি দীক্ষা' যা প্যারি কমিউন-এর মানবমুক্তির কাহিনী অবলম্বনে। রচনা উৎপল দত্ত, প্রয়োগ সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। ৫ এপ্রিল কলকাতার নাট্য আনন-এর 'সীজার'। প্রয়োগ চন্দন সেন, অভিনয়ে তারকা অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। এপ্রিল ২০১৩-র শুরুতে কোম্পানির অনিশ্চয়তা দূর হতে এই স্পনসরশিপ নিশ্চিতই সাহায্য করল। কোম্পানি আরও কিছু দিন গরিব মানুষের টাকা হাতিয়ে নিল নিশ্চিন্তে। তারকা অভিনেতা সব্যসাচী ও বিখ্যাত নাট্যকার সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত আমাদের মাঝে মানবমুক্তির শিক্ষা পৌঁছে দিলেন। আমরা মানবমুক্তির শিক্ষা পেলাম। আর গরিব মানুষদের প্রতারিত হওয়ার সময় আরও দীর্ঘায়িত হল।

কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশন কভারের অভিজ্ঞতা

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ২০ এপ্রিল

রাজ্য সরকারের বাজেট পেশের পর, আর্থিক সংকটে জর্জরিত, ধার দেনায় ডুবে থাকা কলকাতা পুরসভা ২০১৩-১৪ সালের জন্য ১৪৫ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে, গত ১৬ মার্চ। বস্তি উন্নয়নের জন্য ১০৪ কোটি টাকা ও সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা এবারের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় পাঁচ কোটি টাকা বেশি। বর্ষায় বৃষ্টিতে জল যাতে না জমে, নিকাশি ব্যবস্থা উন্নতির জন্য ছ-হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে আরও ২৯টি পাম্প বসানো হবে জানানো হয়েছে। জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ও জল অপচয় রোধে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলা হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। মহানগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নততর করতে দু-হাজার ছ-শো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ২০টি উর্দু স্কুল ও ১২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র করা হচ্ছে। পুরসভার স্কুলগুলির জন্য আরও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পুরসভা বিনামূল্যে ছাতা, বই-খাতা, জুতো-মোজা দেবে, তার জন্য ব্যয়বরাদ্দ দু-হাজার কোটি টাকার বেশি। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য ৩০ হাজার টাকার স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার ১২ লক্ষ বস্তিবাসীর কল্যাণে পুরসভা ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে বলে জানিয়েছে। কলকাতার ১৪১টি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবার জন্য ১৩ হাজার মানুষ নিয়োগ করা হয়েছে।

বাজেট পেশের পরেই বাজেট অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়, মাঝে কয়েকজন মেয়র পারিষদ বক্তব্য রাখে। কিন্তু বিরোধীদের বাজেট নিয়ে কথা বলতে দেওয়া হয়নি।

বাজেট অধিবেশনের দিন কলকাতা পুরসভার সামনে শাসক দলেরই কিছু কর্মীর বিক্ষোভের কথা শোনা গেল। ১০০ দিনের কাজ পাওয়া নিয়ে ওইদিন পুরসভার সদর দফতরের সামনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পুরোনো দিনের কর্মীরা অভিযোগ জানাল। এদের অনেকেই একদম শুরু থেকে পার্টিতে থাকলেও এলাকার কাউন্সিলরের কাছে ১০০ দিনের কাজ চেয়ে পায়নি বলে অভিযোগ।

পরিশেষে একটা নৈরাজ্যের কথা না বলে পারছি না। কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন, বিশেষ অধিবেশন ও বাজেট অধিবেশনে সাংবাদিকদের ভালো ভালো খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়। এই প্যাকেট যারা সাংবাদিকদের দেওয়ার দায়িত্বে থাকে, সেই অতনু রায়, পিন্টু চক্রবর্তীদের ঘনিষ্ঠ কিছু লোক ওই ক-দিন দল বেঁধে হাজির হয়ে যায়। এরা অধিবেশন কক্ষে না বসে, যেখানে সাংবাদিকদের ফুড প্যাকেট দেওয়া হয়, সেই গুমটি ঘর ও তার পাশের চায়ের দোকানে দল বেঁধে জটলা করে। প্যাকেট দেওয়া শুরু হলে তারা হুড়োহুড়ি করে প্যাকেট নেয়। অনেককে নাম ধরে ডেকে ডেকে প্যাকেট দেওয়া হয়। তার ফল, সত্যিকারের সাংবাদিকদের অনেকে ফুড প্যাকেট পায় না। কলকাতা পুরসভায় শাসক দল বদলালেও ট্র্যাডিশনের বদল হয়নি।

চূর্ণি নদীর দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে, হেলদোল নেই পরিবেশ দপ্তরের

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ২৮ মে •

বর্ষার মুখোমুখি নদিয়া জেলার অন্যতম নদী চূর্ণি আবার ভয়ঙ্কর দূষণের কবলে। বছরে অন্তত চার থেকে পাঁচবার বাংলাদেশ সীমান্ত দর্শনা চিনি কলের সঞ্চিত বর্জ্য নির্গমনের ফলে এই দূষণ প্রতি বছরেই কয়েকবার করে ঘটে থাকে। ট্রেনের মধ্যে জনমত বলছে যে বিভিন্ন রকম দূষিত পদার্থ ফেলে মাছ মেরে ফেলবার একটা চক্রও এর মধ্যে কাজ করছে কিছু ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকে। যাই হোক না কেন এক বিস্তীর্ণ নদী এক বছরের মধ্যে বেশকয়েকবার এইরকম দূষণের কবলে পড়েছে। অনেকবার প্রশাসনকে ও দূষণ পর্ষদকে জানানো সত্ত্বেও কোন সুরাহা মেলেনি। হেলদোল নেই নদীর আশেপাশে বসবাসকারী মানুষজনেরও।

আগামী ৫ জুন, আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে, চূর্ণি নদীর এই দূষণ রোধে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনকে সক্রিয় করতে স্থানীয় কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মারুতির ছাঁটাই শ্রমিকদের ওপর হরিয়ানা সরকারের হামলা, প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২২ মে •

মারুতি সুজুকির সংগ্রামী শ্রমিকদের লড়াইকে সংহতি জানিয়ে আজ বেলা তিনটেয় সংগ্রামী শ্রমিক মঞ্চ সহ বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন মিছিল করে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত। কয়েকশো মহিলাসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক এই মিছিলে অংশ নেয়। এর দু-দিন আগে জনা পঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে ক্যামাক স্ট্রীটে মারুতির একটি পুরোনো অফিসে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে আসে।

গত বছর জুলাই মাসে হরিয়ানার মানেসরের মারুতি সুজুকি কারখানায় একটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। শ্রমিক অসন্তোষের আগুনে ম্যানেজমেন্টের এক কর্তা কারখানার মধ্যে পুড়ে মারা যায়। তার জেরে হরিয়ানা রাজ্যে মারুতি কোম্পানি তাদের ৫৪৬ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ১৮০০ চুক্তি-শ্রমিককে ছাঁটাই করে। জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়, গ্রেফতার হয় ১৪৭ জন।

ওই ১৪৭ জনের মুক্তি চেয়ে, ৬৬ জনের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা বাতিলের দাবিতে এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে মারুতি কারখানার শ্রমিকরা এ বছর ২৪ মার্চ থেকে ধরনা, মিছিল, অনশন শুরু করে। ১৯ মে কাইথাল-এ হরিয়ানার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী রণদীপ সিং সুর্জিওয়ালার বাড়ির সামনে শ্রমিকদের পরিবার পরিজনদের অবরোধ কর্মসূচী ছিল।

কিন্তু ১৮ মে রাত থেকেই ব্যাপক পুলিশ দিয়ে ছেয়ে ফেলা হয় গোটা এলাকা। শহরে ঢোকার রাস্তাগুলি সিল করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা শ্রমিক পরিবারগুলিকে আটকানোর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শতাধিক প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় কাইথালে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ধরনা মঞ্চ।

হরিয়ানার অন্তত ৮৪টি পঞ্চায়েত-প্রধান মারুতি শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে এই মাসের প্রথম সপ্তাহে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এইসব পঞ্চায়েতকে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে হরিয়ানা সরকার।

প্রতিভার খোঁজে — 'চারুচেতনা' (পর্ব এক)

মিত্রা চ্যাটার্জি, সল্টলেক, কলকাতা, ৫ মে •

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে যা সাধারণ এক ঘটনা দিয়ে শুরু, আজ তা পূর্ণাঙ্গ এক প্রতিষ্ঠান। পনেরো বছর আগে দক্ষিণ কলকাতায় ত্রিকোণ পার্কের সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কলকাতার কর্পোরেশন সেই পার্কের সংস্কারে হাত দেয়। তৎকালীন অন্যতম শিল্পী অসিত পালের ওপর তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। পার্ক জঞ্জালে ভর্তি। সেই জঞ্জাল দিয়েই এক স্থাপত্যের ভাবনা ভাবলেন তিনি। কিন্তু নোংরা ঘাঁটবে কে? পথশিশুই লক্ষ্য হল। হাতের পাতা প্লাস্টিকে ঢেকে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নোংরা জড়ো করে অসিতবাবুর নির্দেশনায় এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেলল মাঠের এক কোণায়। সেই কাজ করতে করতে অসিতবাবু এই পথশিশুদের মধ্যে দেখলেন চাপা পড়া অনেক প্রতিভা, চারু চেতনা।

এই অভিজ্ঞতা অসিতবাবুকে ভাবাল কেমন হয় পিছিয়ে থাকা সমাজ থেকে গুণী শিশুদের খুঁজে বার করা, তাদের এক সুন্দর রঙিন জগতের সন্ধান দেওয়া। এই ভাবনা থেকে তৈরি হল 'চারুচেতনা' সংস্থা, কিছু সচেতন মানুষজন একত্র হলেন অসিতবাবুকে কেন্দ্রে রেখে। কসবা অঞ্চল তখন আজকের এই কসবা নয়। আর্থিকভাবে অনুন্নত বহু মানুষের বসতি। কেউ রিক্সাচালক, কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ বা জনমজুর। এদের বৌ-রা কাজ করে লোকের বাড়ি বাড়ি। কুড়িয়ে আনা হল দশ বারোজন শিশুকে। মায়েরা করলেন সহযোগিতা। সব বাবারা নয়। বাবাদের যুক্তি — খাটলে দু-পয়সা আয়, ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে কি লাভ? তবু মায়েদের স্বপ্ন বড়োবাবুদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মতো এরাও শিখবে ছবি আঁকা, কবিতা, গান, নাচ।

কসবার মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লস-এর প্রধান শিক্ষিকার কাছে আবেদন করা হল, যদি সন্ধ্যেবেলায় এক-দুটো ঘর পাওয়া যায়। রোজ নয়, যদি সপ্তাহে দু-দিনও হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হল এই ভালো কাজের জন্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যে এবং শনিবার বিকেলে ছেলেমেয়েরা জড়ো হতে লাগল সেখানে।

এমনি করে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে পনেরো বছর উত্তীর্ণ হল। কিন্তু কী পেল এই ছোটোরা? পেন্সিল ধরে ছবি আঁকার স্বপ্নগুলি ফুটে উঠল কাগজে। কাগজ, পেন্সিল, রঙ আর স্বপ্নগুলি জোগালো চারুচেতনা। এরা অনেকেই স্কুলছুট। কেউ বা ফেল করে একই ক্লাসে বারবার। মনে সন্দেহ তারা কি আদৌ কিছু হয়ে উঠতে পারবে? কিন্তু কিছুদিন বাদে এদের শিল্প কাজের প্রদর্শনী হল। অকুণ্ঠ প্রশংসা পেল। ছোটোরা বুঝল কিনা জানি না, মায়েরা বুঝল, পারবে তাদের ছেলেমেয়েরা কিছু করে উঠতে। উৎসাহ দ্বিগুণ হল।

পরবর্তীকালে প্রতিবছর প্রদর্শনী হল, এবং তা হতে লাগল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের গ্যালারিতে। সঙ্গে থাকত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওয়ার্কশপ। বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, কোচবিহার থেকে গ্রামীণ শিল্পীরা এসে কাজ শেখাত ছোটোদের। কাঠ খোদাই, শোলা, মুখোশ, মাদুর বোনা — এরকম অনেক কিছু। প্রথম দিকে 'মঞ্জুষা'র মতো হস্তশিল্প সংস্থা আর্থিক ব্যয় বহন করতেন এবং সার্টিফিকেটও দিতেন। যাঁরা প্রদর্শনী দেখতে আসতেন তাঁরা শিশুদের কাজ এবং শিল্পকর্মে রত শিশুদের দেখে আপ্লুত হতেন। স্বেচ্ছায় অর্থদানও কেউ কেউ শ্রমদানের অঙ্গীকার করতেন।

সংস্থায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তিরিশের কাছাকাছি। মনের আনন্দে তারা রঙ দিয়ে রঙিন করে তাদের ভাবনা, খোদাই করে বের করে আনে স্বপ্নে দেখা মুখ, মুখোশ। 'সরা'-তে ছবি এঁকে ফোটায় দৈনন্দিন জীবনের দোলা ও ছন্দ। প্রাচীন ভারতের বাংলার শিল্পের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে, বর্ধমানের কাঠের প্যাঁচা, রাজারাণী, গণেশ, শোলার নৌকা, পুরুলিয়ার ছৌ-মুখোশ, আদিবাসীদের রেখার টান (ওড়াল), ম্যুরাল, কাগজের মণ্ডের মুখোশ, কোলাজ। পৃথিবীর দিগন্তের দিকে মুখ তুলে তাকাল তারা অনেক দূর অবধি দেখতে পেল। বাড়ি ফিরে, বস্তির ঝগড়া, মারপিট, হিন্দিগানে তারা আর হারিয়ে গেল না। উপেক্ষা করতে শিখল।

ছেলেদের আত্মবিশ্বাস আনতে চারুচেতনার স্বেচ্ছাসেবীরা ছাত্রদের নিয়ে পড়াতে বসলেন। অঙ্ক, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল। সপ্তাহে আরও দিন বাড়ল। ছোটোরা বড়ো হল, এক একটা ক্লাস পেরিয়ে মাধ্যমিকে বসল, উত্তীর্ণ হল সম্মানের সাথে।

এখন তারা বোঝে নাটক, কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। শিক্ষক দিবসে নিজেদের লেখা নাটক অভিনয় করে। নিজেরা তৈরি করে কথা, বসায় গান, যোগ করে নাচ। এরা এখন মূলস্রোতে। খালে আর এদের কুলোয় না, নদীতে এদের বিচরণ।

একবার শিশু চিকিৎসকদের এক মহা সম্মেলন বসে সায়েন্স সিটি প্রাঙ্গণে। অসিতবাবুর কাছে আবেদন আসে, তাঁর এই ছেলেমেয়েদের দিয়ে তিনি কিছু করুন এই সম্মেলনের প্রাঙ্গনে। অনেক রকমের প্যাভিলিয়ন। তার মধ্যে একটা চারুচেতনার শিশুদের। অসিতবাবু রাজি হলেন। বসলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। একটা গল্প শোনালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমেরিকা জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমার আক্রমণ হানল। ধ্বংস হয়ে গেল দুই শহর। সঙ্গে ঘর, বাড়ি, মানুষ। যারা তবু বাঁচল ওই বিধ্বংসী বোমার আক্রমণ থেকে তারা আক্রান্ত হল মরণ রোগে, পারমাণবিক বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তার। এমনই এক শিশু ভর্তি হল হাসপাতালে। কিন্তু সে ভাবতেই পারে না, মৃত্যু কী? সে কেবল ভাবে রোজ যদি সে একটা করে সাদা পায়রা ওড়ায় আর ভগবানকে প্রার্থনা করে তবে সে একদিন নিশ্চয়ই সে ভালো হয়ে যাবে। সব সুন্দর হয়ে যাবে। কিন্তু পায়রা কোথায় পাবে সে? তাই রোজ একটা করে সাদা কাগজের পাখি সে হাসপাতালের জানলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। মেয়েটি কিন্তু বাঁচে না। সে চলে গেলেও যুদ্ধ একদিন থামল। পৃথিবীর মানুষ শান্তির খোঁজে আরও কত মীমাংসায় পৌঁছল। কত সাদা পায়রা ওড়ালো সবুজ শান্ত পৃথিবীর আশায়।

ছেলেমেয়েরা গল্প শুনছিল। গল্প থামতেই অসিতবাবু, তাদের হেডস্যার, বললেন, 'এই গল্পটা ছবি এঁকে বলতে হবে। তোমাদের ভাবনা মিশিয়ে।' নির্বাচন করলেন ছোটো বড়ো আটজনকে। বললেন, 'গল্প আঁকবে এক সঙ্গে সবাই মিলে চার ফুট বাই কুড়ি ফুট একটা ক্যানভাসে। এতদিন জলরঙে কাজ করেছো। এবার তেলরঙে।' কুড়ি ফুট লম্বা ক্যানভাসকে পাঁচ ভাগ করা হল। অর্থাৎ এক একটা চার ফুট বাই চারফুট। বললেন, গল্প এগোবে এমনভাবে যে এই এক একটা চারফুট বাই চারফুট ক্যানভাস হবে এক একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্প। যে কোনো একটাই একটা গোটা গল্প হয়ে উঠবে।

মহড়া হল অসিতবাবুর বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা তেল রঙে তৈরি হল। তৈরি হল চেতনায়, তারপর এল সেইদিন যেদিন সম্মেলনের প্রাঙ্গণে তারা আঁকতে এল। বড়ো ২০ ফুটের ক্যানভাস। সামনে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম। নয়তো ছোটোরা যে হাত পাবে না। একসঙ্গে আটজনের কাজ। প্রতিদিন ছবিটা একটু একটু করে ফুটে উঠছে। প্রতিদিন শরীরে শিহরন। কী অসাধারণ চেতনাবোধ প্রকাশিত হচ্ছে। কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নেই; শিল্পী তো আটজন। চতুর্থ দিনে যেদিন ছবিটা সম্পূর্ণ হল কেউ ধরে রাখতে পারল না চোখের জল।

বোমা বিস্ফোরণের লাল আগুন ছড়িয়ে আছে ক্যানভাসের বাম দিকে। ভয়ঙ্কর কমলা লাল আগুন। উত্তপ্ত আগুন থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তস্নাত নদী — শুধু একটি মেয়ে সাদা পোশাকে হাত উঁচু করে উড়িয়ে চলেছে কাগজের পাখি আর সে পাখিদের পথ ধরে চলেছে সেই নদী। দর্শকের মনোযোগ যত এগোয়, রক্তাক্ত পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে সবুজ পৃথিবী। সবুজ থেকে শান্তির নীল পৃথিবী ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আকাশ পাখি নদী গাছগাছালি। ভালো মানুষের স্বপ্নের পৃথিবী। ওরা কেমন করে বুঝল আজও বোধগম্য নয়। ছবির দাম উঠল চল্লিশ হাজার টাকা। কিনলেন চিকিৎসকদের সংস্থা 'পেডিকন'। *ক্রমশ*

'গ্রামে রক্তদাতাদের উৎসাহ দেখে আমাদের লজ্জা লাগে'

পলান কুণ্ডু, সুন্দরবন সরবেড়িয়া হাসপাতাল, ২২ মে •

সরবেড়িয়া শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার এক যুগ পূর্ণ হল। ২০০২-এর ১২ মে রক্তদান দান শিবিরের মাধ্যমে এই হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। একইভাবে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন আজও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করে চলেছে। 'রক্তদান জীবনদান' -এই কথাটি বিভিন্ন মাধ্যম বিভিন্নভাবে প্রচার করে থাকে। এবং আমরা যারা নিজেদেরকে একটু এগিয়ে থাকা মানুষ হিসাবে মনে করি তারা প্রত্যেকেই একথা জানি। এতদসত্ত্বেও রক্তদান শিবিরগুলিতে রক্তদাতাদের অভাব যথেষ্টই চোখে পড়ে। গত কয়েকবছর যাবৎ আমি সরবেড়িয়ায় এই দিনটিতে উপস্থিত থেকে অনুভব করেছি এখানকার ছবিটা সম্পূর্ণই উল্টো। এখানে রক্তদাতাদের সংখ্যা এতই বেশি যে হাসপাতালের কর্মীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। রক্তদান করতে গেলে শারীরিক কিছু সুস্থতার দরকার হয়। যেমন রক্তের চাপ ঠিক আছে কিনা বা অল্প কিছুদিনের মধ্যে কোন ভারী রোগ হয়েছিল কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেখেছি যে রক্তদাতার রক্তের চাপ কম, তথাপি সে লবণ-চিনির সরবত খেয়ে রক্তের চাপ বাড়িয়ে নিয়ে রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আরেকটা ঘটনার কথা বলি, একজন বয়স্ক মানুষের কোলে একটি বছর চারেকের শিশু কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়স্ক মানুষটি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তার কান্না থামাবার। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। শিশুটি কাঁদছে কারণ তার রক্ত নেওয়া হচ্ছে না। তার নাম রক্তদাতাদের খাতায় লেখা হলে কান্না থামে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার একেবারেই অনামী গ্রাম সরবেড়িয়া। মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন সেখানে কিছু চাষবাস আর মাছের ভেড়িতে কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে বা রিক্সা চালানো। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার কোনো সুযোগ পায়নি। যেখানে চিকিৎসার জন্য ৭০ কিমি দূরে কলকাতা শহরে আসতে হয়। সেখানকার মানুষের মধ্যে রক্তদানের আগ্রহ আমাকে অভিভূত করে, লজ্জাও দেয়। এই রক্তদান শিবিরে সরবেড়িয়ার আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে মানুষজন দল বেঁধে রক্ত দিতে আসে। পাঁচ থেকে সাত কিমি পথ পায়ে হেঁটে। এই রক্তদান শিবিরে আমার শরীরের সামান্য রক্ত দিতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। এবছর রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৯ মে ২০১৩।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 23 1 June 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

শান্তিপুরের ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর পূজা

দীপঙ্কর প্রামাণিক, শান্তিপুর, ২৭ মে। ব্রহ্মার জল সাধার ছবি শুভম পালের তোলা। •

শান্তিপুরের বৈশাখী পূর্ণিমায় বড়োবাজারের ব্যবসায়ী সমিতি আয়োজন করে ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর পূজার। তৎসহ পূজিতা হন দেবতাত্রয়ের স্ত্রীরাও। যথাক্রমে গায়ত্রী–লক্ষ্মী–পার্বতী। এই পূজাকে তাঁরা কল্পনা করেন প্রজাপতি ব্রহ্মার বিবাহ উৎসবরূপে।

ওই পূজার পূর্বদিন রাত্রে বিবাহের জলসাধা আয়োজিত হয়। এতে শান্তিপুরের লোকসংস্কৃতির অন্যতম ময়ূর পঙ্খীর গান পরিবেশিত হয়। জলসাধার শুরুতে গরুর গাড়ির ওপর নারদরূপে এক ব্যক্তি সজ্জিত হয়ে ঢেঁকি বাহনে চড়ে শোভাযাত্রায় নির্দিষ্ট রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুরবাসীকে আমন্ত্রণ জানান। হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে দিয়ে কাল্পনিক খাবারের নাম, সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা, রাজনৈতিক–সামাজিক বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ঢেঁকি বাহন–নারদের নিমন্ত্রণ শেষ হলে ওই স্থানে পরবর্তী ময়ূরপঙ্খীর গান পরিবেশিত হয়। গরুর গাড়ির ওপর একটি বাঁশের ময়ূরাকৃতি নৌকা তৈরি করে তার ওপর এক ব্যক্তি ময়ূরপঙ্খীর গান পরিবেশন করেন। তাঁর সহযোগী গায়ক থাকেন দু–একজন এবং বাদ্য হিসাবে থাকে ঢোল কাঁশি। ময়ূরপঙ্খীর গান বিশেষ সামাজিক দিককে তুলে ধরে। এই গান অনেকটা প্রাচীন খেউর বা খেড়ুগানের মতো। কিছুটা আদি রসাত্মক বা অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত। তবে বর্তমানে অশ্লীলতা বা আদিরসাত্মক শব্দ ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হয়েছে। এছাড়া থাকে আলো বাদ্যসহ জলসাধার প্রক্রিয়া, যেখানে পুরুষেরা বেনারসী অলঙ্কার ইত্যাদি পড়ে মেয়ে সেজে কুলো ডালা মাথায় করে বের হয়। এছাড়াও পুতুল নাচ, বিভিন্ন জীবন্ত মডেল ইত্যাদি এই শোভাযাত্রায় শামিল করা হয়। শান্তিপুরের এই পূজা দুশো বছরের বেশি প্রাচীন বলে দাবি করা হয়। পূজা চলে ছয়দিন। বহু মানুষের সমাগম পূজার ওই দিনগুলিতে।

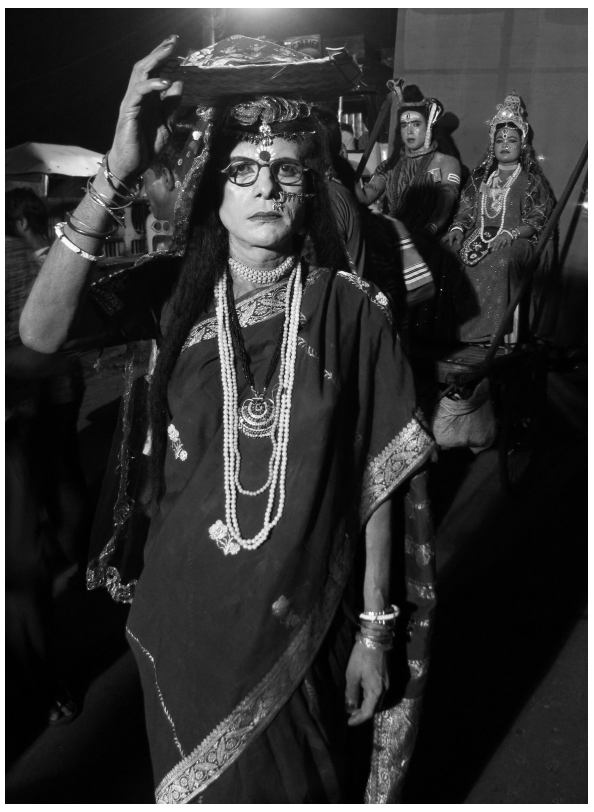

চার মেয়ের নবদ্বীপ–মায়াপুর ঘুরে আসা (শেষ পর্ব)

কাজরী রায়চৌধুরি, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি •

এবার আর নবদ্বীপ আমাদের হতাশ করল না। রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা হতে লাগল, পথে বড়ো বাড়ির বদলে একতলা চালাঘর, পুকুর আর গাছের সারি চোখ জুড়িয়ে দিল। ঘন্টা আধেক চলার শেষে উঁচু পাঁচিল দেওয়া গেটের সামনে রিকশা থামল।। গেট দিয়ে ঢুকতেই এক ভিখারিনী বলে উঠলেন, 'কী হতভাগিনী তোমরা গো, মন্দিরের বন্ধ দরঝা দেখতে এলে!' কী আর করা। এগিয়ে গেলাম সামনে। খুব ছিমছাম শান্ত নিরাভরণ বাগান ঘেরা পরিসর। একটি মাটির কুঁড়েঘর, ওপরে খড়ের চাল। তার দাওয়ায় শচীমাতা নিমাইকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাটির মূর্তি। পাশেই সেই নিমগাছ। পাশ দিয়ে তখন বয়ে যেত গঙ্গা। অন্যপাশে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তিনটের আগে দরজা খুলবে না। না খুলুক। হাজার হাজার দর্শনার্থী নবদ্বীপে এসে জন্মভিটে না দেখেই চলে যায়। আমরা সেই আসল সম্পদটির দেখা পেলাম। এবার ফিরে চললাম নদীর ঘাটে। নৌকা পেরিয়ে আবার মায়াপুরে।

হোটেলে খেয়ে নিলাম, তারপর চলেছি বল্লাল সেনের ঢিবি, চাঁদ কাজীর স্থান এবং ইসকন নির্মিত মায়াপুর দেখতে। ১৯৮৩ সালে সরকার ঢিবিটি অধিগ্রহণ করে খননকার্য শুরু করে। অসম্পূর্ণ। যেটুকু দেখা গেল, উঁচু দীর্ঘ ছোটো পোড়া ইটের পাঁচিল এবং ইটের দোচালা ঘরের আভাস। ঢিবির বাকি অংশ ঘাসে মোড়া। তখন সূর্যাস্তের মিঠে আলোয় আমরা চারজন ঢিবির চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীরবে অনুভব করছি 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন–যৌবন–ধনমান'।

চৈতন্যদেবে চাঁদ নামক এক কাজীকে বাঁচিয়েছিলেন তার নামেই এ জায়গার নাম। এখানে একটি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। অশত্থ গাছ আর গোলক চাঁপা গাছ একদম পাশাপাশি উঠেছে। দুটি কাণ্ড। একসময় মিলে গিয়ে পাঁচটি শাখায় ছড়িয়ে গেছে। ভক্তরা কল্পনা করে, এটি রাধাকৃষ্ণের প্রতীক। আর পাঁচটি শাখা জগাই মাধাই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কাণ্ডের তিনটি গিঁটে স্থানলাভ করেছেন। আপাতত 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু ...'।

ফিরতি পথে এবার ইসকনের রাজ্যে। শুনলাম কয়েকজন আমেরিকান বৈষ্ণব এখানে কয়েক হেক্টর মুসলিম প্রধান গ্রাম কিনে নেয়। জায়গাটার নাম ছিল মিঁয়াপুর। কালক্রমে আমেরিকান বৈষ্ণবদের আগ্রাসনে বা ধর্মপ্রাণে নাম হয় মায়াপুর। সারা সকাল নবদ্বীপে গিয়ে যা যা দেখলাম, এমনকি নিমগাছ সহ জন্মভিটে পর্যন্ত — সবেরই আরও মার্জিত, সজ্জিত, আধুনিক প্রতিলিপি এ মায়াপুর। তার থেকেও বড়ো কথা, এদের দাবি এগুলোই আসল। এই মায়াপুরেই চৈতন্যদেবের জন্ম–কর্ম। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ স্বদেশি–বিদেশি মায়াপুরে আসছে এবং নকল চৈতন্যস্থান দেখে ফিরে যাচ্ছে। চৈতন্যভূমির নতুন ইতিহাস তৈরি করবে ইসকন।

সন্ধ্যেয় দেখি সারা রাস্তা জুড়ে আলপনা দিচ্ছে সাহেব–মেম এবং এদেশীয় ভক্তরা। একটু এগোলেই দুটি বিশাল আকারের মোষে টানা রথ। রথে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। সাজানোর শেষ টান চলছে। দর্শনার্থীর ভিড়ে হাঁটাই দায়। আর একটু এগোতেই দেখি দুটি হস্তি শাবক দাঁড়িয়ে লেজ আর শুঁড় দোলাচ্ছে। পিঠে তিনজন করে ভক্ত। এবার তো জানতেই হয় ব্যাপারটা কী! শুনলাম শনিবার, তাই হস্তি পরিক্রমা হবে। মন্দির চত্বরে মাইকে নামগান করতে করতে ভক্তরা চলেছে। সঙ্গে রথ ও হাতি দুটি। এই কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনা দেখবারই বটে। সাহেব–মেমদের চোখে জলের ধারা, হরেকৃষ্ণ ধ্বনি থেকে থেকে আকাশ–বাতাস মুখরিত করে তুলেছে।

সন্ধ্যেবেলা আরতি দেখতে আমরা চারজনই গুটিগুটি পায়ে মন্দিরে ঢুকলাম। এত বড়ো মন্দির? বিগ্রহ বলতে রাধাকৃষ্ণ আর সখিরা। রাধা একেবারে মেমসুলভ। কৃষ্ণও তাই। আর সখিদের মুখের ধাঁচ মণিপুরীদের মতো গোল, বড়ো, চ্যাটালো। এখানে প্রায় সব বিগ্রহই মণিপুরী আদলের। মণিপুরের সংস্কৃতি ও কারিগরদের সৃষ্টি এই মূর্তিগুলি। আমরাও ঢুকলাম আর আরতি শেষ হল। পাশে প্রায় শ–চারেক নারী–পুরুষ মেঝেতে বসে। মাইকে নানা সুরে লয়ে হরেকৃষ্ণ নামগান সহ সমবেত নৃত্য চলছে। পরিবেশনায় ন্যাড়ামাথা টিকিধারী সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত জনা তিরিশ সাহেব, সেই নাচের তালে দু–হাত ওপরে তুলে শ–চারেক শ্রোতা দর্শকও সঙ্গত করে তুলেছে। দৃশ্যের অভিঘাতে আমরা বাক্যিহারা। ঘরে ফিরলাম আটটা নাগাদ।

নৈশভোজের ঘন্টা পড়ল। সকালেই টিকিট কেটে রেখেছিলাম। নিরামিশ আহার প্রতি প্লেট চল্লিশ টাকা। বসলাম শতরঞ্চি পাতা মেঝেতে। থালা রাখার জায়গাটা একটু উঁচু করে বাঁধানো। এক ব্যাচে প্রায় পাঁচশোজন খেতে পারে। প্রত্যেকটা গামলার নিচে চাকা লাগানো। ভাতের গাড়ি, ডালের গাড়ি, সবজি ও আলুর দমের গাড়ি গড়গড়িয়ে লাইন করে চলে এল। প্রতিটি গাড়ির সাথে দু–জন করে পরিবেশক। একজন ডান সারিকে অন্যজন বাঁ–সারিকে অতি দ্রুততায় পরিবেশন করে চলেছে। একটি থালা পাঁচ সেকেন্ডে ভরে গেল, সব মিলেমিশে একাকার। ঝাল–নুনহীন বৈষ্ণব প্রসাদে পেট ভরলেও মন ভরল না।

পরদিন সকাল ন–টায় ব্যাগ গুছিয়ে ইসকনের মায়াপুরকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশের মেলায় গ্রাম্য কারিগরদের তৈরি জিনিস কমছে

সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর মজিলপুর, ৩১ মে •

মজিলপুরের কালীর বেশের মেলাকে এখন গ্রাম্য মেলা বলা যাবে না। কারণ এই মেলায় গ্রাম্য কারিগরদের হাতে তৈরি জিনিস ক্রমশই কমছে। জায়গা নিচ্ছে কারখানায় তৈরি নানান জিনিসপত্র। সাধারণ মেলাগুলোতে গ্রাম্য ছুতোরদের তৈরি কাঠের নানা আসবাবপত্রই বেশি জায়গা নেয়, কিন্তু এখানে আসবাবপত্রের কোনো স্টল থাকে না। রকমারি মনোহারি জিনিসের দোকানই বেশি। তবে তার মধ্যেও আমার ভীষণ লোভ লাগে সিউড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নানারকমের আচার, মোরব্বা, হজমি, পাচক, পানপোর, কাসুন্দি ইত্যাদির স্টল দেখে। বাঙালির এই শিল্পটির বৈচিত্র্য দেখে অবাক হতে হয়। কী নেই এখানে। স্টলের ওপরে সব লেখা আছে আর স্টলের সামনে সারি সারি সাজানো বয়াম থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে।

এত অদ্ভুত জিনিসের আচার হতে পারে, আমার জানা ছিল না। যেমন, বৃন্দাবনের বাঁশের আচার, রসুনের আচার ইত্যাদি ১২ রকমের। আবার ওই স্টলটাতেই একদিকে লেখা রয়েছে কল্যাণী শিল্প প্রতিষ্ঠান। তার তলায় লেখা চিংড়ি মাছের পানপোর। এও হয় নাকি? দেখে খুব অবাক লাগে। আমের পানপোর, মেদিনীপুরের গহনা বড়ি, ডালিমের হজমি, মুগ ডালের ৬ ধরনের বড়ি, জোয়ান পাচক, হিং মশলার বড়ি, পোস্তর বড়ি। স্টলের কর্মচারী বলল, ২৫ বছর এই মেলায় আসছে। এদের বাড়ি কল্যাণীতে। সিউড়ি থেকে আচার ইত্যাদি এনে বিক্রি করে নিজেদের তৈরি জিনিসের সাথে। মায়ের পুকুর বা পদ্ম পুকুরে উত্তর দিকে ওষুধ দোকানের উল্টোদিকে বরাবর বসে এরা। এবার দেখলাম দুটো স্টল এই রকম। অন্যটা বছর দু–তিন আসছে।

মুর্শিদাবাদ থেকে কাঠের বেলন চাকি ইত্যাদি নিয়ে যারা প্রতিবারই ওই পুকুরের দক্ষিণ কোণে বসে তারাও এসেছে। খাজা, গজা, জিলিপির লোভনীয় সম্ভার ছাড়া মেলা হয় নাকি? এরকম দোকান ৪–৫ টা, নির্দিষ্ট জায়গাতেই। কিন্তু তাদেরকে ছাপিয়ে গেছে অন্নপূর্ণা, গৌরাঙ্গ নামের বিরাট বিরাট রেস্টুরেন্ট। সেখানে চেয়ার টেবিলে পাতা। মেলার সব চাইতে বড়ো দোকান এইগুলোই। নানান বিদেশি খাবারের নাম ওপরে লেখা। সামনে স্তূপাকার ঢাকাই বাকরখানি বলে লুচির মত চেহারার, কিন্তু বেশ বড়ো আকারের। এসব মেলা দেখতে আসা ক্ষুধার্ত মানুষকে আকর্ষণের কৌশল। অনেক লোক বসে খাচ্ছেও।

তবে মেলায় সব থেকে আওয়াজ আর হৈ চৈ হয় বাকের মাঠে মরণ কূপে। সেখানে বিপজ্জনক ভাবে মোটর সাইকেল ঘোরে। আছে মিউজিয়াম। বাইরে নানান সব বিচিত্র প্রাণীর ছবি থাকে। আর রয়েছে মেলার সবথেকে উঁচু আকর্ষণ ইলেকট্রিকে চলা দৈত্যাকার নাগরদোলা, ধন্বন্তরী যাত্রীনিবাসের সামনের মাঠে। পাশেই ইলেকট্রনিকের মজাদার বিশাল ঘূর্ণায়মান জয় রাইডের পাশে ময়ূরমুখো ট্রেন চলছে। ছোটো বড়ো যাত্রী নিয়ে প্রায় চৌকো লাইন ধরে। আগেকার খুব ছোটো নাগরদোলাগুলো কয়েকটা এদের ফাঁকে ফাঁকে তাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখনও কোনোরকমে। মন্দিরের চাদনির পাশে মায়ের পুকুরের দিকে মুখ করে বরাবরের মতো তিনটে কামারের স্টলই বোধ হয় সবথেকে ভালোভাবে গ্রাম্য কারিগরদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই মেলায় ওদের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়নি, যদিও জৌলুষহীন লাগছে অন্যান্য সব দোকানের পাশে।

খবরে দুনিয়া

বিদেশি বিনিয়োগে বাণিজ্যিক চাষ মেক্সিকানদের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিচ্ছে

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ২৫ মে •

কৃষিতে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ও খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগ শুধু কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষিজমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং কেবল সেই দেশ বা আভ্যন্তরীণ বাজার দখল করে থেমে থাকে না, সেই দেশের মানুষের খাদ্যাভাসেরও পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। লাতিন আমেরিকান দেশ মেক্সিকো হল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোর অধিবাসীরা কানাডার বাসিন্দাদের তুলনায় মাথা পিছু বেশি খাদ্য গ্রহণ করত। কিন্তু ১৯৮৬ সালের পর থেকে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। মেক্সিকানদের খাদ্যাভাস এবং খাদ্য গ্রহণের উপাদানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আগে তারা শাক–সবজি, ফল খেত বেশি। এখন তার পরিবর্তে বেশি বেশি করে মাংস খাচ্ছে। মেক্সিকোর ওটেরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইমন ফারসেরের বক্তব্য, অনেক দেশে ২০০৯ সালের পর থেকে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটেছে। লোকে দুধ ও মাংস নির্ভর হয়ে গেছে।

কানাডায় উৎপাদিত কানোলা তেল ভাজা ও ফাস্ট ফুড খাওয়ার জন্য মেক্সিকোতে সবচেয়ে বেশি আমদানী হয়। এতে মেদ বাড়ে ও লোকে মোটা হয়ে যায়। মেক্সিকানরা তাদের চিরাচরিত খাবার টাকোস ও জামাইকা ফলের রস পান করা ত্যাগ করে। তার পরিবর্তে হামবার্গার ও পেপসি পান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। আর এই ভাবে খাদ্যাভাস বদলে যাওয়ার দরুন মোটা হওয়া ও মেদ বৃদ্ধিতে মেক্সিকো বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম দেশ হিসাবে গণ্য। তা মেক্সিকানদের ডায়বেটিসে আক্রান্ত হবার অন্যতম কারণও বটে। এই কারণে মেক্সিকোতে শিশুর জন্ম দেবার পর হাসপাতালে মারা যাওয়ার সংখ্যাও বেশি।

১৯৯৪ সালে নর্থ আমেরিকান ফ্রি–ট্রেড এগ্রিমেন্ট ন্যাফটা সংস্থার সাথে মেক্সিকো সরকারের চুক্তির পর থেকে ন্যাফটা কৃষি বাণিজ্যে অগ্রাধিকারের সুবিধা আদায় করেছে। তার পরিণতিতে মেক্সিকোর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা তাদের কৃষিজমি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে কৃষিকাজ পরিত্যাগ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মেক্সিকোর শহরগুলিতে, খনিতে তারা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

মেক্সিকোর খনিগুলির বেশিরভাগ মালিকানা বিদেশিদের, তার মধ্যে অধিকাংশ খনির মালিক হল কানাডার কোম্পানিগুলি। ন্যাফটা মেক্সিকোর ভূমি আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, নুতন ভূমি আইন বানিয়ে সরকারি বা সমষ্টি মালিকানাধীন কৃষিজমিকে বেসরকারিকরণ করে দিয়েছে। মেক্সিকোর বেশির ভাগ কৃষকই ৫ হেক্টর প্লটের কৃষিজমির মালিক ছিল। তারা সরকারি ঋণে, সার ও বীজের জন্য পাওয়া সরকারি সাহায্যের দৌলতে বছরে ৭৮ থেকে ১০২ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করত। মেক্সিকোর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বর্তমানে এক কিলো ধান বা গম ইত্যাদি উৎপাদন করতে ৩.৭২ ডলার ব্যয় হয়, সেখানে বাণিজ্যিক কৃষিখামারগুলির উৎপাদন–ব্যয় হল ১.৬৭ ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার এই কৃষিবাণিজ্য কোম্পানিগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয় বলে কৃষকরা ধান ও গম, ভুট্টা, বীন ইত্যাদি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে।

'ট্র্যাজেডি নয়, হত্যাকাণ্ড'

আলাল ও দুলাল ব্লগ থেকে, ৩১ মে •

২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের সাভারের রাণা প্লাজা ধসে পড়ে মারা গেছে ১১২৭ জন গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাদ দিলে এটি সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়। রাণা প্লাজায় উদ্ধারকার্য চলেছে ২১ দিন ধরে। আহত ও নিহতদের আত্মীয়স্বজনরা সারা দিন রাত হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে অধর চন্দ্র পার্ক থেকে শুরু করে এনাম ক্লিনিক–এ। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মৃতদেহ ভরা কফিনগুলোর ওপর।

এ জিনিস বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে নতুন নয়। বস্তুত বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ভবন ধসে পড়া এবং আগুন লাগায় অভ্যস্ত। ১৯৯০ সালে শারকা গার্মেন্টস–এ ২৭ জন শ্রমিক আগুনের ভয়ে পালাতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। ১৯৯৫ সালে লুকাস গার্মেন্টস–এ আগুন লেগে দশ জন মারা যায়। ১৯৯৬ সালে সানটেক্স গার্মেন্টসে মারা যায় ১৪ জন শ্রমিক। ১৯৯৭ সালে রহমান গার্মেন্টসে মারা যায় ২২ জন শ্রমিক। ওই বছরই তামান্না গার্মেন্টসে মারা যায় আরও ২৭ জন। ২০০০ সালে চৌধুরি নিটওয়ারে মারা যায় ৫৩ জন শ্রমিক। গত বছর তাজরিন ফ্যাশনসে আগুন লেগে মারা যায় শতাধিক শ্রমিক।

ঢাকার দৃক গ্যালারিতে রাণা প্লাজা নিয়ে একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৩১ মে, চলবে ৫ জুন অবধি। এই প্রদর্শনীর নাম 'ট্র্যাজেডি নয়, হত্যাকাণ্ড'। সঙ্গের ছবিটি এই প্রদর্শনীর — শুভ্র কান্তি দাসের ক্যামেরায় অধর চন্দ্র স্কুলের গায়ে সাঁটা নিঁখোজ খুলনার শ্রমিক আসমা আখতারের ছবি।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল
: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.